প্রাথমিক শিক্ষা

না লটারি না পরীক্ষা, অঞ্চলভিত্তিক ভর্তি

মঞ্জুরে খোদা

মঞ্জুরে খোদা

প্রকাশ: ১৮ মার্চ ২০২৬ | ০৭:২৯

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ ও শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের মধ্যে একটি আলোচনা নজর কেড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতি কী হবে– পরীক্ষা, না লটারি; সেটা নিঃসন্দেহে আলোচনার বিষয়। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও আমরা প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ভর্তির পদ্ধতিই ঠিক করতে পারিনি। অথচ এটি শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়।

শিশুশিক্ষা বা প্রথম শ্রেণিতে যারা ভর্তি হয় তাদের বয়স ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যে। এই সময় শিশুরা কেবল তাদের মতো কথাবার্তা ও যোগাযোগ করতে শেখে। শিশুরা তখন প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন পর্যায়ে থাকে না যে তাদের মেধা ও জানা-শোনা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইযোগ্য। সেটা করা মানে শিশুদের প্রতি অবিচার ও অভিভাবকদের জন্য

মানসিক চাপ সৃষ্টি করা। ইউনিসেফের মতে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শিশুদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ ও লেখাপড়ার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে পারে।

শিশুরা কে কতটা মেধাবী তা সহজে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কেননা, মেধার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক, আরোপিত ও কৃত্রিম ধারণাপ্রসূত। বিষয়টি আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পদ ও সুযোগের মাধ্যমে তৈরি। যাদের সে সুযোগ থাকে না, তারা পিছিয়ে পড়ে। উচ্চবিত্তরা দামি স্কুল তৈরি করে সেখানে সন্তানদের ভর্তি করিয়ে মেধাবী বলে স্বীকৃতি উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য ও বিভাজন তৈরি করে।

যখন ভর্তির জন্য মেধা যাচাইয়ের প্রশ্ন আসবে তখন বাণিজ্যনির্ভর শিক্ষা, কোচিং সেন্টার, প্রতিযোগিতা, দুর্নীতি ও প্রভাব-তদবিরের বিষয় আসবে। এমন কথা ইউনস্কোর এক প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায়, এটি বৈজ্ঞানিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয়। সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বা চালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ বা যৌক্তিকতা নেই।

উন্নত বিশ্বের কোথাও শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ধরনের কোনো ব্যবস্থার প্রচলন নেই। এমনকি প্রতিবেশী ভারত, শ্রীলঙ্কাতেও নেই। তাহলে শিশু শিক্ষার্থীরা কোন পদ্ধতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
ভর্তি হয়?

উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হতে লটারিতে অংশ নিতে হয় না; ভর্তি পরীক্ষায়ও বসতে হয় না। যে যে এলাকায় বসবাস করে তাকে বাধ্যতামূলক সেই এলাকার বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এক এলাকার শিক্ষার্থীকে অন্য এলাকায় যেতে হয় না। যে কারণে শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেখানে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না। বাবা-মা, অভিভাবকদের কোনো হয়রান হতে হয় না; দুশ্চিন্তা করতে হয় না। এ ব্যবস্থা চালু হলে ভর্তি পরীক্ষা বা লটারি কোনোটার দরকার নেই।

বাংলাদেশকেও ভর্তির প্রচলিত বিরক্তিকর, বিতর্কিত, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে 'জোনিং' বিদ্যালয় ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যে যে এলাকায় বাস করে, তাকে সেই এলাকার স্কুলে যেতে হবে। এক এলাকার ছেলেমেয়ে অন্য এলাকায় যেতে বা পড়তে পারবে না! এ ব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় গুণ-মানের ভারসাম্য আসবে। তথাকথিত নামিদামি স্কুলের জন্য এক এলাকা থেকে অভিভাবকদের অন্য এলাকায় দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না! ভর্তি নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না! কোচিং সেন্টার, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও ডোনেশন প্রথা উঠে যাবে। রাস্তাঘাটে জ্যাম ও যানবাহনের ঝামেলা কমবে। শিক্ষার্থীরা একা ও অভিভাবকের সঙ্গে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে পারবে। অভিভাবকদের শিশুদের সঙ্গে গিয়ে স্কুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে না ও বিপুল শ্রমঘণ্টার অপচয় হবে না।

যেমন আমার দুই পুত্র। একজন জাপান ও একজন কানাডায় তাদের প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ করেছে। এই দুই দেশেই আমি যেখানে বসবাস করেছি, তারা সেখানকার স্থানীয় স্কুলেই লেখাপড়া করেছে। সেখানে আমাকে লটারি বা ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়নি। এসব দেশে শিক্ষা শিশুর জন্মগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত; সুযোগের বিষয় নয়। সে কারণে রাষ্ট্র অবধারিতভাবে সকল শিশুর মানসম্পন্ন ও নিরাপদ শিক্ষা নিশ্চিত করে। শিক্ষা রাষ্ট্রের কাছে লাভজনক বিনিয়োগ। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ থিওডর শলজসহ অনেকে দেখিয়েছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রে বহুভাবে ভূমিকা রাখে।

জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রথম চার বছর কোনো পরীক্ষাও দিতে হয় না। এখানকার শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা মনে করেন, স্কুল শুরুর প্রথম চার বছর শিশুদের মেধার মূল্যায়ন করার জন্য যথেষ্ট সময় না। বরং এই সময়ে তাদের আদব-কায়দা, স্বভাব-চরিত্র ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন, প্রাণ-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ও ব্যবহারিক বিষয়গুলো শেখানোয় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সন্তানদের প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবই আমি চোখে দেখিনি; স্কুলেই সব পড়িয়ে বাসায় নামমাত্র হোমওয়ার্ক দেওয়া হতো।
শিক্ষার সমন্বিত রূপের বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার বিষয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, উন্নত দেশগুলোর অনুসরণে শিক্ষার একমুখী ও সময়োপযোগিতাকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সেখানে শিক্ষার মান, ধারা, পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগ, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার স্তর, অর্থায়ন, গবেষণা, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলেছেন, কাজটি কঠিন, জটিল ও চ্যালেঞ্জের।

ড. মঞ্জুরে খোদা: লেখক ও শিক্ষা উন্নয়ন গবেষক